অমর একুশে বইমেলা
চার দশকে ফিরে দেখা

সংকলন ও সম্পাদনা
এস এম জাহাঙ্গীর কবীর

ঐতিহ্য

উ ৎ স র্গ

সরদার জয়েনউদ্‌দীন
চিত্তরঞ্জন সাহা
কাজী মুহম্মদ মনজুরে মওলা
শামসুজ্জামান খান
মুহম্মদ নূরুল হুদা

অমর একুশে বইমেলা উদ্ভব, বিকাশ ও বিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত প্রণম্য গুণীজন

ভূমিকা

বইমেলার ইতিহাস এবং বাংলাদেশের বছর প্রায় সমান। আর এর শুরু চিত্তরঞ্জন সাহার হাত ধরে। ১৯৭২ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি তিনি বাংলা একাডেমির বর্ধমান হাউসের সামনে বটতলায় চটের ওপর ৩২টি বই সাজিয়ে বইমেলার সূচনা করেন। যদিও বইমেলা সর্বপ্রথম ঢাকার বাইরে নারায়ণগঞ্জে শুরু করেন সরদার জয়েনউদ্‌দীন। এরপর ১৯৭৩ সালে বাংলা একাডেমি একুশে উপলক্ষে ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বিশেষ হ্রাসকৃত মূল্যে একাডেমি প্রকাশিত বই বিক্রির ব্যবস্থা করে। অন্যান্য প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানও এতে অংশ নেয়।

বাংলা একাডেমির তৎকালীন মহাপরিচালক কাজী মনজুরে মওলা ১৯৮৩ সালে প্রথম অমর একুশে গ্রন্থমেলার আয়োজন সম্পন্ন করেন, যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে 'অমর একুশে গ্রন্থমেলা' শুরু হয় ১৯৮৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে। সেই হিসেবে এ বছর ২০২৪ সাল 'অমর একুশে বইমেলা'র ৪০ বছর পূর্তি। প্রথম দিকে ১৫ দিন, ২০ দিন বইমেলা হলেও এখন ফেব্রুয়ারি মাসজুড়ে এই মেলার ব্যাপ্তি। বইমেলার পরিসর বৃদ্ধির কারণে বাংলা একাডেমি চত্বরে স্থানসংকুলান না হওয়ায় ২০১৪ সালে এই মেলা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সম্প্রসারিত করা হয়। এই ৪০ বছরে বইমেলার বাঁক্‌বদল নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকসহ অন্যান্য পত্রপত্রিকায় বাংলাদেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, লেখক, কবি-সাহিত্যিক, শিল্পী লেখনীর মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। তাঁরা বিভিন্ন সময়ে বইমেলার ভালো-মন্দ দিক নিয়ে যেমন আলোচনা-সমালোচনা করেছেন, তেমনি পরামর্শও দিয়েছেন কীভাবে একটি সুন্দর বইবান্ধব মেলার আয়োজন করা যায়।

দেশবরেণ্য বুদ্ধিজীবী, লেখক, কবি-সাহিত্যিকের বইমেলা-সম্পর্কিত ৪০টি প্রবন্ধ/নিবন্ধ নিয়ে আমার এই সংকলিত ও সম্পাদিত সংকলন 'অমর একুশে বইমেলা : চার দশকে ফিরে দেখা'। এক মলাটে বইমেলা নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা, পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা। আশা করি, পাঠকের ভালো লাগবে ও এ বিষয়ে গবেষণাকর্মে সহায়ক হবে।

এই পাণ্ডুলিপি তৈরি সম্ভব হয়েছে আমার প্রিয় সহকর্মী ও সুহৃদ কবি পিয়াস মজিদের ঐকান্তিক সহযোগিতা ও পরামর্শে। আমার সহকর্মী ড. কুতুব আজাদ বিভিন্ন সময় বই ও পত্রিকা দিয়ে সহযোগিতা করে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

এই পাণ্ডুলিপি কম্পোজের কাজ দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করেছেন মো. শরীফ হোসেন, তাঁকেও ধন্যবাদ জানাই।

আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি 'ঐতিহ্য'র প্রধান নির্বাহী জনাব আরিফুর রহমান নাইম ভাইয়ের প্রতি।

বাঙালির প্রাণের মেলা বইমেলা দিন দিন আরো বিস্তৃত ও পাঠকবান্ধব হবে– এই আমাদের প্রত্যাশা।

এস এম জাহাঙ্গীর কবীর
ফেব্রুয়ারি ১৫, ২০২৪

সূচি

একুশে ও বাংলা একাডেমি ১১
জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী ১১

মনীষার দীপ্ত গ্রন্থাবলি আমাদের উজ্জ্বল উদ্ধার ১৬
শামসুর রাহমান ১৬

এখন আর বইমেলা কেবল বই কেনার জন্য নয় ২০
ফয়েজ আহমদ ২০

অমর একুশে বইমেলায় ২৫
মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান ২৫

একুশের চেতনা : একুশের বইমেলা ২৮
আহমদ রফিক ২৮

অমর একুশে গ্রন্থমেলা : কিছু স্মৃতি কিছু কথা ৩৩
রফিকুল ইসলাম ৩৩

হৃৎকলমের টানে : প্রসঙ্গ বইমেলা ৩৬
সৈয়দ শামসুল হক ৩৬

ফেব্রুয়ারি আশা ও উত্তেজনার মাস ৪০
আল মাহমুদ ৪০

একুশের মেলা নিয়ে ভাবনা ৪৫
আবুবকর সিদ্দিক ৪৫

বইমেলার এই দিনে ৪৮
সালেহ চৌধুরী ৪৮

বইমেলা : কিছু স্মৃতি, কিছু কথা ৫১
হাসানাত আবদুল হাই ৫১

একুশে ফেব্রুয়ারির কোলাজ ৫৬
আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ ৫৬

দেখা হলো বইমেলায় অবেলায় ৬১
বেলাল চৌধুরী ৬১

বইমেলা এবং একুশে ৬২
হাসান আজিজুল হক ৬২

বইমেলা তুমি কার ৬৬
বিপ্রদাশ বড়ুয়া ৬৬

এই আমাদের বইমেলা ৬৮
আনোয়ারা সৈয়দ হক ৬৮

বাংলাদেশে বইমেলার উদ্ভবের ইতিহাস এবং নতুন আঙ্গিকে বইমেলা ৭৩
শামসুজ্জামান খান ৭৩

বিশ্বের দীর্ঘতম বইমেলা : ঢাকার অমর একুশে ৭৭
আবদুশ শাকুর ৭৭

একুশের বইমেলায় ৮৫
রশীদ হায়দার ৮৫

অমর একুশে গ্রন্থমেলা : কিছু স্মৃতি, কিছু কথা ৮৯

রবিউল হুসাইন ৮৯
বইমেলায় যাই রে ৯৪
আসাদ চৌধুরী ৯৪
একুশের বইমেলা ৯৯
হোসনে আরা শাহেদ ৯৯
বইমেলা এবং আমি ১০৩
রফিকুন নবী ১০৩
ডিজিটাল বাংলাদেশ ও অমর একুশে গ্রন্থমেলা ১০৯
মহিউদ্দিন আহমদ ১০৯
আমাদের বইমেলা ১১৪
ফরহাদ খান ১১৪
বই, বইমেলা ও প্রকাশনাজগৎ ১১৭
সৈয়দ আবুল মকসুদ ১১৭
অমর একুশে গ্রন্থমেলা : কিছু স্মৃতি কিছু কথা ১২১
সেলিনা হোসেন ১২১
কয়েকটি বইমেলার অভিজ্ঞতা ১২৪
সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ১২৪
যে ভেলা : একাডেমি বইমেলা ১৩০
হাবীবুল্লাহ সিরাজী ১৩০
বইমেলা মেধাস্বত্ববান হোক ১৩৬
মুহম্মদ নূরুল হুদা ১৩৬
আলো-অন্ধকারে বইমেলা ১৪৪
আলতাফ হোসেন ১৪৪
পাঠক সৃষ্টিতে বাংলা একাডেমির অমর একুশে গ্রন্থমেলার ভূমিকা ১৪৮
মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর ১৪৮
বইমেলা ১৫৮
সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম ১৫৮
আবার জমবে মেলা ১৬৪
সেলিম জাহান ১৬৪
বই ও বইমেলা ১৬৮
মুনতাসীর মামুন ১৬৮
বই, বইয়ের মেলা ১৭৬
মুহম্মদ জাফর ইকবাল ১৭৬
বইমেলায় প্রথম দিন ১৮৩
রণজিৎ বিশ্বাস ১৮৩
সংস্কৃতিচেতনা ও অমর একুশে গ্রন্থমেলা ১৮৬
বিশ্বজিৎ ঘোষ ১৮৬
বইমেলা বইয়ের মেলা নয়, সমাজের জানালা ১৯৪
আলী রিয়াজ ১৯৪
এবারের বইমেলা সুন্দরতম ১৯৮
আনিসুল হক ১৯৮

একুশে ও বাংলা একাডেমি

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী

মহান একুশের দুটি প্রতীক আছে, এক প্রতিষ্ঠান, বাংলা একাডেমি। শহীদ মিনারে ইতিহাস খুঁজতে গেলে ফিরে যেতে হয় বায়ান্নর ফেব্রুয়ারিতে। এবং সে ইতিহাসও লিখেছেন ড. রফিকুল ইসলাম, বাংলা একাডেমি প্রকাশিত ভাষাশহীদ গ্রন্থমালা সিরিজে। আবার বাংলা একাডেমির অতিকায় ইতিহাস রচনা করেছেন বশীর আল্‌হেলাল। এ সংবাদ হয়তো সকলের জানা নেই, তাই এবারের এই ফেব্রুয়ারিতে স্মরণ করছি, সবাইকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য।

স্মরণ করিয়ে দেওয়ার এই ইচ্ছাটার পেছনে একটা চিন্তা কাজ করছে, শুরুতেই সেটা স্বীকার করছি। ফেব্রুয়ারি আমাদের আবেগের মরসুম। আমাদের আবেগ অনেক বড় পুরস্কার বয়ে এনেছে, যখন সেই আবেগ নিছক আবেগ ছিল না, যখন তা যুক্তির হাতে হাত মিলিয়ে চলেছিল। বায়ান্নয়, উনসত্তরে, একাত্তরে আমরা তা-ই দেখেছি। আবার আমাদের আবেগ প্রায়শই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে এবং আমাদের ব্যর্থতা, হতাশা, ক্রোধ দিয়ে তাড়িত হয়ে উন্মত্ত আচরণ করেছে। আমাদের সবচেয়ে পবিত্র স্থান, সবচেয়ে পবিত্র মুহূর্তকে অপবিত্র করেছে। যেখানে মাথা নত করে প্রার্থনায় নম্র হয়ে, নিঃশব্দে, রুদ্ধনিশ্বাসে যেতে হয়, না গেলে শ্রদ্ধা নয় অশ্রদ্ধাই প্রকাশ পায়, সেখানে আমরা দেখেছি জনতার বিশৃঙ্খল, অশোভন, এমনকি উৎকট আচরণ, ঠেলাঠেলি মারামারি, হানাহানি– কী নয়? এর কারণ কী, আমরা জানি আমাদের সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনের অমীমাংসিত প্রশ্নগুলো, কিন্তু আমরা ভুলে যাই, আমাদের আবেগতাড়িত মুহূর্তে যে অনেক অমীমাংসিত প্রশ্ন নিয়েই আমাদের চলতে হয়, যেহেতু আমরা মানুষ। যত উঁচু পর্যায়ে আমাদের জীবন

ও চেতনা, তত দুরূহ ও জটিল আমাদের প্রশ্ন, আমাদের গ্রহণ-বর্জনের সমস্যা।

কথাটাকে অত্যন্ত সহজ, অথচ স্মরণীয় ভাষায় বলেছেন রুশ কবি পাস্তেরনাক : জীবনটা এত সরল নয়, মাঠ পেরিয়ে হেঁটে যাওয়ার মতো। তবে এটা সকল মানুষের কথা নয়, যত প্রশ্ন-দ্বন্দ্ব-সমস্যায় ঘেরা যাদের জীবন, সেই নৈতিক নাগরিক চেতনায় সদাজাগ্রত মানুষের কথা। গ্রহণ-বর্জনের সমস্যা সকলের নয়, যারা মানুষ হয়েও মানবেতর জীবন যাপন করছে তাদের তো নয়ই। যে অভুক্ত, সে তো খয়রাতি খাদ্যের পেছনে ব্যক্তিটির পরিচয় জানতে চাইবে না– তার কাছে হালাল-হারাম নেই, কারণ, তার সর্বগ্রাসী ক্ষুধা তাকে নৈতিকতার জগৎ থেকে দূরে রেখেছে। আর প্রচুর ভোগ-সম্পদের মধ্যে বাস করেও যার সর্বগ্রাসী ক্ষুধা, সে-ও নির্বাসিত, তবে স্বেচ্ছানির্বাসিত– নৈতিকতার বৃত্ত থেকে। আমাদের সমাজে এই দুই ধরনের ক্ষুধার্তের সংখ্যাই বেড়ে চলেছে।

মধ্যবর্তী অবস্থানে যারা, তাদের সংখ্যাও কম নয়। মানুষ শুধু বুদ্ধিমত্ত জীব নয়, অ্যারিস্ততল যা বলে গিয়েছেন, নৈতিকতাও তার সত্তার এক মৌলিক বৈশিষ্ট্য। তা যদি না হতো, তাহলে আজ বাংলাদেশে আমরা দুর্নীতির বিরুদ্ধে এত কথা বলতাম না, এত কথা জানতাম না। দেশ দুর্নীতির মধ্যে তলিয়ে গেছে– এ শুধু আমার-আপনার কথা নয়, সংসদের মেঝেতে মাননীয় মন্ত্রীর কথা– আর দুর্নীতির প্রসঙ্গে তিনি শুধু কালোবাজারি আর শিল্পপতিদের কথা বলেননি, সবার আগে রাজনীতিওয়ালাদের কথাই বলেছেন– আশ্চর্য সত্ত্বেও এবং এই দুর্নীতির মধ্যে যার যতটুকু ফায়দা, সেটা চুপিসারে তুলে নেওয়া ও আমরা ভুলে যাইনি নীতি ও দুর্নীতির মধ্যেকার তফাতটুকু। কথাটা তাহলে এই যে বুদ্ধিমত্ত মানুষেরা নির্বোধের মতো কাজ করতে পারে, তবে এতটুকু বুদ্ধি তার ঘটে সব সময়ই থাকে; তেমনি নৈতিক মানুষ অনৈতিকতার ডুবে গেলেও মানুষের সামগ্রিক নৈতিকতা, পারিপার্শ্বিক নৈতিকতা কখনোই একেবারে হারিয়ে যায় না; বাতাসের তরঙ্গে ভেসে থাকে, অতএব, আমাদের নিশ্বাসে-প্রশ্বাসেও থাকে।

আমাদের বুদ্ধি, আমাদের নৈতিকতা ও আমাদের আবেগ– এর যেকোনো একটি নয়, তিনটিকে একসঙ্গে, এক দেহে, এক হৃদয়ে ও মস্তিষ্কের ধারণ করেই আমরা চলি। ফেব্রুয়ারির সমস্যা হলো এই যে 'মহান একুশের' এই মাসটিতে আমাদের আবেগ অভিমাত্রায় জাগ্রত, অতএব, আমাদের বুদ্ধি সমপরিমাণে সুপ্তিপরায়ণ। আমাদের আবেগজনিত অনর্থের ও দুর্ঘটের

অকুস্থলে পরিণত হয়েছে শহীদ মিনার এবং আমাদের বাংলা একাডেমি। শহীদ মিনারে, একুশের মধ্যরাত থেকে, আইনশৃঙ্খলা-শোভনতা রক্ষা করার দায়িত্ব পালন করে আসছে, ঐতিহ্যগতভাবে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের প্রধান রঙ্গমঞ্চ। আর বাংলা একাডেমির চত্বরে পুরো এক মাস, অন্তত তিন সপ্তাহকাল ধরে যে বিচিত্র অনুষ্ঠানমালা, যা কখনো কখনো, দুর্ভাগ্যজনকভাবে কলঙ্কিত হয়েছে কিছু কিছু দুষ্কৃতি ব্যক্তির, হঠকারিতায় বা ইচ্ছাকৃত দুষ্কর্মে– সেখানে আইনশৃঙ্খলা-শোভনতা রক্ষার দায়িত্ব বলতে গেলে জনসাধারণের। পুলিশের উপস্থিতি, বাংলা একাডেমিতে, নিছক নিয়মরক্ষার বেশি কিছু নয় এবং সেটা বস্তুত দৃষ্টিসীমার বাইরে। স্বেচ্ছাসেবকেরা এ দায়িত্ব পালন করে থাকে, তবে পরিকল্পিত বিশৃঙ্খলা রোধ করার ক্ষমতা এদের নেই।

ইতিহাসের কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম। ইতিহাসচর্চার, ইতিহাস পাঠের অনেক উপকারিতা আছে। জনান্তিকে বলে রাখি, আমি সাহিত্যের ছাত্র, কিন্তু আমার আনুগত্য দ্বিধাবিভক্ত। ইতিহাসের ছাত্র, এত বড় দাবি করি না, তবে আমার চিন্তা, আমার যুক্তি সব সময় ইতিহাসের সমর্থন খোঁজে এবং আমার অনিয়মিত কিন্তু অব্যাহত ইতিহাস পাঠ আমাকে একটি শিক্ষা দিয়েছে– সে হলো একমাত্র ইতিহাসই পারে আমাদের আবেগের আগ্রাসন থেকে রক্ষা করতে। আমাদের আবেগ আমাদের সম্পদ, যতক্ষণ তা আমাদের শাসনে আছে। আবেগ আমাদের শত্রু, যদি আমরা শাসিত হই আবেগের দ্বারা।

বাংলাদেশের প্রতিটি পবিত্র স্থানকে পবিত্র করেছে, আবেগ, অপবিত্র করে থাকে বুদ্ধিহীন আবেগ। শহীদ মিনারে নেতাদের প্রতিকৃতি নিয়ে কিছুদিন আগে যা ঘটে গিয়েছে, তা দুঃখজনক বললে কিছুই বলা হয় না। মধ্যরাতের সেই মাহেন্দ্রক্ষণে ফুলের মালা নিয়ে যদি তরুণীরা আর না যায়, তাহলে তারও পেছনে আছে অতীতের এক কদর্য ঘটনা...কথাটা ভুললে চলবে না।

আবেগের সঙ্গে আছে ইতিহাসের এক অঘোষিত যুদ্ধ। আবেগ বলে শহীদ মিনার আমার, একান্তই আমার, ওরা এখানে আসবে না। ইতিহাস বলে শহীদ মিনার, রমনায়, মিরপুরে, সাভারে,...সকলের যে সেখানে যেতে চায় পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা নিয়ে। যদি কারো মনে শ্রদ্ধার কিছু ঘাটতি থেকেও থাকে, তবে সে বিচার করবার অধিকার তোমাদের নেই। বাংলা একাডেমি চত্বর যদিও উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা, তবে প্রকৃত প্রস্তাবে এটা মুক্তাঙ্গন– এখানে সকলেরই প্রবেশাধিকার আছে। কেউ আমার মতাবলম্বী নয় বলে আমি তাকে সম্ভাষণ করা থেকে বিরত থাকতে পারি, তবে তার আসা-যাওয়ার পথ আটকাতে পারি

না। যদি সে চেষ্টা করি, তবে গণতান্ত্রিক সমাজের পক্ষে কথা বলার অধিকার আমি হারাব।

একটি আপ্তবাক্য চালু হয়ে গেছে– চালু হয়ে গেছে যেহেতু এর মধ্যে আছে সত্য : ভাষা আন্দোলন থেকেই সূত্রপাত আমাদের, বাংলাদেশের, স্বাধীনতাসংগ্রামের। এই বাক্যটির মধ্যেই ধরা পড়েছে ইতিহাসের ধারাবাহিকতা। শহীদ মিনার, বাংলা একাডেমি, বাংলাদেশ, আমাদের সম্ভ্রান্ত, অতিসম্ভ্রান্ত, জাতীয় সংসদ– সবই এসেছে ইতিহাসের ধারাবাহিকতায়। সকল বাঙালির গণতান্ত্রিক অধিকার আছে এর প্রত্যেকটিতে উপস্থিত হওয়ার। সংসদে অবশ্য প্রয়োজন হচ্ছে না সশরীর হাজির হওয়ার, তবে আমার প্রতিনিধির মাধ্যমে সে অধিকার আমাকে দিয়েছে বাংলাদেশের সংবিধান। সে জন্যই সংসদের অনুপস্থিত থাকার সিদ্ধান্ত খুব সহজ সিদ্ধান্ত নয়। সে জন্যই সংসদ থেকে বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্তও সহজ ছিল না এবং সেটা সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল কি না, তা এখনো বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়। বেরিয়ে না এলে সংবিধানের হানিকর যে সংশোধনীগুলো বিনা ক্লেশে পার হয়ে গেল, তা কি সম্ভব হতো– এ প্রশ্ন আজ অনেকেই করেছেন। আমি নিজে এ প্রশ্নে এখনো দ্বিধান্বিত। হামেশাই, আমার সকালের হাঁটার, আমার প্রতিবেশী দেয়ালের যে লেখনটি আমার দৃষ্টিকে কেড়ে নেয় সে হলো : এলাকাবাসীর প্রতি অনুরোধ, ৩ জুনের নির্বাচনে যাবেন না। বড় বড় সাদা অক্ষরে লেখা এই অনুরোধ বাক্যটি জলে-বৃষ্টিতে প্রায় মুছে এসেছে, তবে একটা প্রশ্ন করে চলেছে এখনো : এলাকাবাসী কী পেল এই অনুরোধ রক্ষা করে। এটা প্রতিপাদন করা আমার উদ্দেশ্য নয় যে বর্জনমাত্রেই অফলপ্রসূ, যেহেতু তা নেতিবাচক। সংসদ চত্বরের চতুষ্পার্শ্বে আমার গতিবিধি, আমার সকাল-সন্ধ্যার ভ্রমণ, কেউ বন্ধ করেনি, কিন্তু সংসদে আমার প্রবেশাধিকার নেই, যেহেতু সংসদে আমার প্রতিনিধি নেই। তাই বলে সংসদের ওপরে আমার দাবিকে আমি তুলে দেব না। এবং দ্বিতীয়বার স্বেচ্ছানির্বাসনের আগে আমি অন্তত তিরিশবার চিন্তা করব।

এই চিন্তার অনুসরণে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে, ইতিহাস আমাকে সাহায্য করে। বাংলা একাডেমির যে অতিকায় ইতিহাসের কথা বলছিলাম, অবসরমতো সেটা একদিন অবশ্যই পড়ব এবং অন্যদেরকেও বলব– আপনারাও পড়ুন। পড়লে দেখতে পাবেন, একজন মানুষের মতোই একটি প্রতিষ্ঠানেরও জীবনে কত বাঁক, কত উত্থান-পতন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ইতিহাস রচনা করেছেন প্রয়াত অধ্যাপক এম. এ. রহিম। পড়ে দেখুন। অনেক বাঁক পেরিয়ে, অনেক উত্থান-পতনের বন্ধুর পথ বেয়ে একটি

জাতীয় প্রতিষ্ঠান চলেছে, বেঁচে আছে। মাঝেমধ্যে দুর্দিন এসেছে, তাই বলে অধ্যাপকমণ্ডলী পদত্যাগ করেননি, অভিভাবকেরা ছেলেমেয়ের ভর্তির পথ রুদ্ধ করেনি। কনভোকেশন হয়নি, পরীক্ষা পিছিয়েছে, সহিংসতায় দুর্বহ হয়েছে জীবন– সবকিছু সত্ত্বেও দেশ তো বর্জ্যের ঝুড়িতে ফেলে দেয়নি বিশ্ববিদ্যালয়কে বা আর কোনো প্রতিষ্ঠানকে। জীবনের একটা দাবি আছে, যা আত্মসংহারের পথ আগলে থাকে। শেষ পর্যন্ত যে আত্মসংহারের পথকেই বেছে নেয়, সে তো পরাজিত মানুষ।

বাংলা একাডেমি আমাদের অতি গৌরবের ভাষা আন্দোলনের উপহার। স্বভাবতই সারা দেশব্যাপী একুশের উৎসব অনুষ্ঠানমালার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সবচেয়ে সমৃদ্ধ এবং সবচেয়ে জনচিত্ত আকর্ষণকারী হয় বাংলা একাডেমির অনুষ্ঠানমালা। এই অনুষ্ঠানমালা, বিগত বেশ কিছু বছর ধরে, বইমেলা সকলের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে। বইমেলার যারা ভিড় করে, তারা সকলেই বই কেনে না। তবে অনেকেই কেনে। অনেকের সারা বছরের বই কেনা এই কদিনের মধ্যেই হয়ে যায়। কারণ, একসঙ্গে সকল বইয়ের দেখা পাওয়া আর কোথাও সম্ভব নয়। অনেকের হাঁটাচলা দেখে মনে হয়, এরা মেলার মউজেই এসেছে, নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে গ্রহণ করছে মেলার মনমাতানো গন্ধ। অনেকে এসেছে কবি দর্শনে। সম্ভব হলে তাদের প্রিয় কবির রচনা সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থটিতে তার স্বাক্ষর নিতে। একজন কবিকে দেখেছি– খুবই জননন্দিত কবি– তার প্রকাশকের স্টলে প্রতি সন্ধ্যা দাঁড়িয়ে থাকতে ও ক্রেতার অনুরোধে তার স্বাক্ষর দিয়ে বইটির মূল্য দশ গুণ বাড়িয়ে দিতে। বাংলা একাডেমির বিরাট চত্বরে, একদিকে চলছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রবন্ধ পাঠ, আলোচনা, সংগীত– অন্যদিকে চলছে এই মেলা। কোনোটিই তুচ্ছ নয়, কোনোটিই সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়, তবে যা সকলকে সন্তুষ্ট করে সে হলো বাংলা একাডেমির সকল কর্মীর অকৃত্রিম চেষ্টা ও সহযোগিতা। এই একটি মরসুমে কেউ তার নীরস দায়িত্বটুকুই পালন করছেন না– মেলার সকল মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিশে গেছেন।

বাংলা একাডেমির জন্য সকল সমালোচনা এ সময় মুলতবি থাকে, যেগুলো জমা থাকে, ডিসেম্বরের বার্ষিক সাধারণ সভার জন্য। এবার সেটা, যেকোনো কারণেই হোক, ঘোষিত হয়েছিল, তবে পরে বাতিল হয়ে যায়। উচিত ছিল, সেটা মূলত ঘোষণা করে, পরে কোনো এক উপযুক্ত সময়ে পালন করা। সে সময় পেরিয়ে যায়নি। মার্চের শেষ সপ্তাহে হতে বাধা কী?

দৈনিক সংবাদ, ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০

মনীষার দীপ্ত গ্রন্থাবলি আমাদের উজ্জ্বল উদ্ধার

শামসুর রাহমান

প্রথমে শিখেছি শুনে, পরে শিখেছি বই পড়ে। এই শেখার পালা আজও শেষ হয়নি। আজও আমার বই-অন্তঃপ্রাণ। ছেলেবেলায় বইয়ের অক্ষরের চেয়ে ছবির দিকে নজর ছিল বেশি। লুই ক্যারলের অমর সৃষ্টি ছোট্ট মেয়ে অ্যালিস। ছবিহীন বই অ্যালিসের মোটেই পছন্দ হতো না। অ্যালিসের এই মর্জি, বিশ্বাস করি, সকল খোকাখুকির। শিশুরা যখন বড় হতে শুরু করে, তখন ছবিময় বইয়ের প্রতি ওদের পক্ষপাত কমে যায়। তাই বলে ছবির প্রতি আকর্ষণ কমে না। বড় হয়ে আমরা এমন অনেক বই পড়ি, যেগুলো শতকরা একশ ভাগ ছবিহারা। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ আগাগোড়া অভিধান পড়তে পছন্দ করেন। একজন চীনা কবির কথা শুনেছি, যিনি উইলো বনে শুয়ে শুয়ে বিভোর হয়ে পড়তেন অভিধান। অভিধানে তো সাধারণত একটিও ছবি থাকে না, যদিও অগুনতি শব্দের ভেতরে লুকিয়ে থাকে ছবি। তবে কোনো কোনো শব্দার্থ পাঠকের কাছে স্পষ্ট করে তোলার জন্য কোনো কোনো অভিধানে খুদে ছবি থাকে।

বই পড়ার অভ্যাস চটজলদি গড়ে ওঠে না। বইয়ের প্রতি আকর্ষণ বাড়ে আস্তে আস্তে নানা ধরনের বইয়ের সংস্পর্শে এসে। তারপর বই সংগ্রহের ঝোঁক হয়। লাইব্রেরিতে ভালো একটি বই দেখলে সেটি কিনতে ইচ্ছা হয়, রাখতে ইচ্ছা হয় নিজের কাছে। এভাবেই উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে পুস্তকপ্রীতি। এই পুস্তকপ্রীতির ফলে গড়ে ওঠে প্রবাল দ্বীপের মতো ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার। পুস্তকপ্রীতি যাঁর গাঢ়, তিনি বইয়ের মধ্যে থাকতে ভালোবাসেন। তাঁর চারপাশে বই না থাকলে তিনি স্বচ্ছন্দ বোধ করেন না। পুস্তকপ্রেমীর শোবার ঘরেও থাকে সারি সারি বই। কারো কারো টেবিল, বুকশেলফ উপচে পড়ে বই।

ছাত্রজীবনেই বই সংগ্রহে মন দিই। অনেক আগে মাহুতটুলীর একটি বাড়িতে লাইব্রেরি ছিল। এই লাইব্রেরি পরিচালনা করতেন একজন দেশি খ্রিষ্টান। বাইরের লোকজনও লাইব্রেরি ব্যবহার করত। আমারও প্রবেশাধিকার ছিল সেখানে। মনে পড়ে, সেই শীতল, ছায়াচ্ছন্ন গ্রন্থাগারে বসে পুরোনো 'প্রবাসী' এবং 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার বাঁধানো সেট নাড়াচাড়া করেছি, পড়েছি নিবিষ্ট চিত্তে। পরে পাটুয়াটুলীর রামমোহন লাইব্রেরির সদস্য হই। এভাবেই আমার পর্যটন চলতে থাকে গ্রন্থের ভুবনে। সেকালে সদরঘাটে বৃন্দাবন ধর অ্যান্ড সন্স নামে একটি বইয়ের দোকান ছিল। বৃন্দাবন ধর সম্ভবত একদা পগোজ স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন। এই লাইব্রেরি থেকেই মোহিতলাল মজুমদারের কাব্যগ্রন্থ 'বিস্মরণ', কাজী নজরুল ইসলামের 'অগ্নিবীণা', বুদ্ধদেব বসুর 'বন্দীর বন্দনা' এবং প্রেমেন্দ মিত্রের 'প্রথমা' কিনি। বৃন্দাবন ধর অ্যান্ড সন্স, বলা যেতে পারে, সর্বপ্রথম আমাকে আধুনিক বাংলা কবিতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়।

যাহোক, বহুকাল আগে আমার ব্যক্তিগত লাইব্রেরির গোড়াপত্তন হয় মাত্র তিন-চারটি বই দিয়ে। আজ আমার নিজস্ব গ্রন্থাগারের গ্রন্থসংখ্যা খুব বেশি না হলে নেহাত কমও নয়। কারো কারো নজর কেড়েছে আমার লাইব্রেরি। কেউ তারিফ করুক আর না-ই করুক, এই গ্রন্থাগার আমার মস্ত সহায়, জীবন ধারণের অবলম্বন। গ্রন্থহীন জীবন আমি কল্পনা করতে পারি না। রোজ কিছু না কিছু আমাকে পড়তেই হয়। যদি দু-চার দিন বই স্পর্শ না করি, তাহলে মনে হয়, অসভ্য হয়ে যাচ্ছি। সভ্যতার সঙ্গে গ্রন্থের একটি অবিচ্ছেদ্য সংযোগ রয়েছে। যে রেনেসাঁসের কথা আমরা এত বলি, তা কি সম্ভব হতো যদি অতীতে ভাবুক এবং মনীষীগণ গ্রন্থ রচনা না করতেন? আমি এখানে ইয়োরোপীয় রেনেসাঁসের কথা বলছি। সভ্যতার ক্রমবিকাশে পুঁথির বিরাট ভূমিকা রয়েছে, এ কথা অস্বীকার করবে কে?

আমাদের দেশে কি যথার্থ রেনেসাঁস এসেছে? এই উপমহাদেশে প্রকৃত রেনেসাঁসের স্পর্শ তেমন লাগেনি। যদি লাগত, তাহলে উপমহাদেশের সামাজিক চেহারা এ রকম থাকত না। অন্য রকম হতো। এই বিপুল ভূখণ্ডের অধিকাংশ মানুষ প্রশ্নবিমুখ, বৈজ্ঞানিক বিচারবুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে নিজ নিজ ধর্মীয় গোঁড়ামি আঁকড়ে থাকার ব্যাপারে পারঙ্গম, ইহজাগতিকতাবিরোধী। বহু শহুরে শিক্ষিত মানুষও এই তমসাচ্ছন্ন প্রবণতা থেকে মুক্ত নন। এই প্রবণতা থেকে মুক্তি পেতে হলে আমাদের গ্রন্থের দিকেই হাত বাড়াতে হবে। মনীষার দীপ্ত গ্রন্থাবলি আমাদের উজ্জ্বল উদ্ধার।

বই আজ আর শুধু ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা এবং লাইব্রেরিতে সীমাবদ্ধ নয়, বন্দী নয় সাধারণ পাঠাগারে। বই নিজের ঠাঁই করে নিয়েছে সতেজ রৌদ্রালোকে, খোলা হাওয়ায়। বিভিন্ন দেশে বইমেলার প্রচলন হয়েছে। আমাদের দেশেও বইমেলা অনুষ্ঠিত হয় প্রতিবছর। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন শহরে জমে ওঠে বইমেলা। বাংলা একাডেমির খোলা প্রাঙ্গণে মহান একুশ উপলক্ষে এক মাস ধরে বইমেলা চলে। নানা ধরনের বহু বুক স্টল অস্থায়ীভাবে গড়ে ওঠে সেখানে। বিভিন্ন ধরনের বই শোভা বর্ধন করে সেসব বুক স্টলের। বইমেলা লেখক, প্রকাশক এবং পাঠক-পাঠিকার মিলনকেন্দ্র। বইমেলায় আড্ডা জমিয়ে তোলেন লেখক সম্প্রদায়, দর্শনার্থী এবং পাঠক-পাঠিকা, যদিও সুখকর আড্ডার জন্য উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা গরহাজির বইমেলায়। যেখানে একটু অনুকূল পরিবেশ, একটু জায়গা পাওয়া, সেখানেই বসে পড়েন আড্ডাধারীগণ। কোনো কোনো জনপ্রিয় লেখকের সাড়াজাগানো উপস্থিতি, স্বাক্ষরশিকারিদের ভিড় কখনো কখনো বইমেলাকে আরো বেশি চঞ্চল এবং প্রাণবন্ত করে তোলে। যত মানুষ বইমেলায় আসে, তত মানুষ কিন্তু বই কেনে না। অনেকে বই কিনতে আসে না, আসে কৌতূহল মেটাতে। খাবারের দোকানে বসে সময় কাটাতে, খেলনা আর রকমারি জিনিস কিনতে। অনেকে বই কিনতেও আসে। তবে তাদের সংখ্যা রোমাঞ্চকর কিছু নয়। তবু বেশ কিছু বইও তো বিক্রি হয়। বই বিক্রির জোয়ার-ভাটায় লেখক ও প্রকাশকগণ কখনো উল্লসিত, কখনো বিষাদগ্রস্ত হন। এখন লেখকগণ সাধারণত বইমেলায় বই প্রকাশে উদ্যোগী হন। প্রকাশকেরাও ফেব্রুয়ারি মাসকেই গ্রন্থ প্রকাশের মৌসুম হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কোনো কোনো লেখক বইমেলার দিকে চোখ রেখে বেশ কিছু বই প্রকাশ করেন। তাড়াহুড়ো করার ফলে বইয়ের গুণগত মান নিচে নেমে যায়। আধসেদ্ধ খাদ্য রসনাকে তৃপ্ত করতে অপারগ। ফলে খদ্দের নিজেকে প্রতারিত, প্রবঞ্চিত মনে করেন। বইমেলায় নতুন নতুন বই আসবে, এটাই আমাদের প্রত্যাশা। কিন্তু প্রাপ্তির মধ্যে যদি ফাঁক কিংবা ফাঁকি প্রকট হয়ে ওঠে, তাহলে লেখক এবং পাঠক উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হন। লেখকের সুনাম ক্ষুণ্ন হয়, পাঠক মনে করেন তাঁর গাঁটের পয়সা পানিতে গেল।

নাম যখন বইমেলা, তখন এই মেলায় বইয়ের প্রাধান্য থাকা উচিত। বইয়ের চেয়ে যদি অন্য জিনিস প্রধান হয়ে ওঠে, অন্য দ্রব্যাদিই বেশি বিক্রি হয়, তাহলে বইমেলার সার্থকতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। প্রশ্নকর্তাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো অনুচিত। যদি বইমেলায় রুচিশীল, উঁচু মানের বই থাকে, পরিবেশ থেকে পরিচ্ছন্ন এবং শান্তিপূর্ণ, তাহলে ভবিষ্যতে ফেব্রুয়ারি

মাসে বাংলা একাডেমির প্রাঙ্গণ আরো বেশি চিত্তকর্ষক এবং উৎসবমুখর হয়ে উঠবে বলে মনে করি। বইমেলা প্রবীণ এবং নবীন–সব লেখককেই অনুপ্রেরণা জোগায় বলে মনে করি। নইলে বাংলা একাডেমির প্রাঙ্গণে প্রতিবছর নানা বুক স্টলে এত নতুন বই দেখা যেত না।

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন আমাদের আত্ম-আবিষ্কার উদ্বুদ্ধ করেছে, আমাদের রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বিকাশের পথ সুগম করেছে। তাই এই ঐতিহাসিক আন্দোলনকে উপলক্ষ করে যে বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়, তার মর্যাদা রক্ষার জন্য কোনো কোনো ব্যাপারে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করা একান্ত জরুরি। আমি বাক্‌স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। কিন্তু যে বই উদার মানবিকতাকে আহত করে, সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়ায়, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিরুদ্ধে কথা বলে, বাঙালি জাতিসত্তার মর্মমূলে আঘাত হানে, সেই বই যাতে বইমেলায় ঠাঁই না পায়, সেদিকে সংশ্লিষ্ট সবার সতর্ক দৃষ্টি থাকা একান্ত জরুরি। বইমেলা হয়ে উঠুক সুস্থ, মুক্তচিন্তার লীলাক্ষেত্র, অগ্রসর ভাবুক এবং মনীষীর আশ্রয়স্থল, প্রগতি এবং মানবকল্যাণের মূল কেন্দ্র। শত পুষ্পের উদ্যান হোক আমাদের এই বইমেলা। জয় হোক গ্রন্থ এবং গ্রন্থকারের।

উৎস
শামসুর রাহমানের প্রবন্ধ
শ্রাবণ, ২০০০